# জনগণের রক্তে অর্জিত কোটি কোটি টাকা অপব্যয়

## শিল্পকে সাহায্য করার নামে নিজেদের পকেট ভর্ত্তি

### ইনডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশন মন্ত্রীও ধনিকগোষ্ঠির লুণ্ঠন করার যন্ত্র

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

# গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র ( পাক্ষিক )

২য় বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ১লা জুন, ১৯৫০, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির জন্য যে পুঁজির দরকার তাহা উপযুক্ত পরিমাণে না পাওয়ায় ভারতের শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না, এই সকল কথা মানিয়া লইয়া কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রীমণ্ডলি পুঁজির অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই গণপরিষদে ইনডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন বিল নামে একটি বিল উপস্থাপিত করেন। সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে বিলটি গৃহীতও হয়। বিলে করপোরেশনের গঠনরীতি ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়:—

অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা, তাহার মধ্যে ৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয় করা হয় এবং তাহাও নিম্নোক্তরূপে বণ্টন করা হয়।

ভারত সরকার— ১কোটি টাকা
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক— ১ „ „
সিডিউল্ড ব্যঙ্কগুলি—১ „ ২৫ লক্ষ „
জীবনবীমা কোম্পানীগুলি ১ „ ২৫ „ „
অন্যান্য ফিনান্স প্রতিষ্ঠান— ৫০ „ „

(২) করপোরেশন অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত আমানত নেয় না এবং পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঋণ দেয় না। বার্ষিক শতকরা ২।০ হারে লভ্যাংশ দিবার ও শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার গ্যারেণ্টি ভারত সরকার দিয়াছে।

(৩) করপোরেশনের ডিরেক্টরের সংখ্যা ১২ জন; তন্মধ্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্থায়ী এবং সরকার মনোনীত, বাকি ১১ জনের ৫ জন সরকার মনোনীত ও ৬ জন অংশীদারদের দ্বারা নির্বাচিত।

(৪) ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলি দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর বা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত সেইগুলি তাহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের এক তৃতীয়াংশ অথবা একুনে ৫০ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদ সমেত পরিশোধের মেয়াদে ঋণ পাইতে পারে।

(৫) করপোরেশন যাহাতে কোনও চতুর ও প্রভাবশালী উপদলের হাতে গিয়া না পড়িতে পারে ভারত সরকার সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে।

এই ধরণের আরও কয়েকটি ধারা আছে। করপোরেশনের মূলধন কার্য্যতঃ জনসাধারণই জোগাইতেছে কারণ ভারত সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক বা ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলির প্রত্যেকটিই জনসাধারণের অর্থে চলিতেছে। সুতরাং করপোরেশন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের টাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই টাকা যাহাতে চতুর ব্যবসায়ীদের পকেটজাত হইতে না পারে তাহার জন্য জনসাধারণকেই সচেতন থাকিতে হইবে; কারণ ভারত সরকার কাগজপত্রে ও মুখে যত বড় বড় কথা বলুক না কেন একটি ক্ষেত্রেও সে জনস্বার্থ রক্ষা করে নাই। সে ক্ষেত্রে করপোরেশনের বেলায় যে রক্ষা করিবে তাহার স্থিরতা কোথায়? স্থিরতা শুধু নাই তাহাই নহে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় জনতার বুকের রক্তে অর্জিত কোটি কোটি টাকা শিল্পপতিদের সিন্ধুকে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শিল্পগুলিকে উন্নত করার পরিবর্ত্তে যেগুলি নড়বড়ে এবং যায় যায় বলিয়া সেইগুলিকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি না অত্যাবশ্যকীয়, না ঋণ পাইবার উপযুক্ত। তবুও তাহারা পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহার কারণ পুঁজিবাদী আমলে যে কোন করপোরেশনই পুঁজিপতিশ্রেণীর খপ্পরে পড়িতে বাধ্য এবং এক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই। পুঁজিপতি শ্রেণীর যে উপদলের খপ্পরে করপোরেশন পড়িয়াছে তাহাদের সিন্ধুকেই জনসাধারণের রক্ত জল করা টাকা নিরাপদে আশ্রয় লাভ করিতেছে।

দিল্লীর বিখ্যাত কোটিপতি লালা স্যার শ্রীরাম হইলেন করপোরেশনের চেয়ারম্যান। কংগ্রেসী আমল রাম

( শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# রেল দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সরকারী নীতি

## আসল অবস্থা চাপা দিয়া জনসাধারণকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা

### রেল দুর্ঘটনায় বেসরকারী তদন্ত দাবী করুন

ভারতীয় রেলে যে হারে দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে মনে হয় গরীব ভারতবাসীর পক্ষে এইবার হইতে প্রায় হাঁটিয়াই যাতায়াত করিতে হইবে। বড় বড় লোকদের জন্য বিমানপথ আছে। একটি বিমান দুর্ঘটনা হইলে তদন্তের পরিশেষ থাকে না; আর রেল দুর্ঘটনায় এক এক বারেই শত শত লোক নিহত হয়, কয়েক শত আহত হয়, অথচ না হয় তদন্ত কেন দুর্ঘটনা হইল, না হয় প্রতিকারের চেষ্টা। বড়জোর রেল বিভাগের মন্ত্রী বেতারে গণসংযোগ করেন এবং একটি হাজার মিথ্যায় পূর্ণ বিবৃতি দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন। বলিবার কিছু নাই কারণ মন্ত্রীরা যাহা বলিবেন তাহা বিশ্বাস না করিলে কিংবা তাহার প্রতিবাদ করিলে ধরা পড়িতে হইবে, কম্যুনিষ্ট হিসাবে তাহার পরেই 'সাবোটাশের' অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইবে। সরকারী রেলনীতির জন্য যে ভারতবর্ষে এত ঘন ঘন রেলদুর্ঘটনা ঘটিতেছে তাহা মন্ত্রীমণ্ডলী স্বীকার করিতে একেবারেই নারাজ।

সম্প্রতি ভারতের রেলমন্ত্রী শ্রীগোপাল স্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় জানাইয়াছেন যে, আমাদের দেশে যতগুলি দুর্ঘটনা হয় তাহার মধ্যে শতকরা ১৫টি 'সাবোটাশ' ও বাকি ৮৫ টির কারণ রেলকর্ম্মচারীদের অমনোযোগিতা। এক ঢিলে দুই পাখী মারার এমন চমৎকার চেষ্টা বড় একটা চোখে পড়ে না। একদিকে সরকার বিরোধীদের ঘাড়ে রেলদুর্ঘটনার কারণ চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে লোকচক্ষে জঘন্য চরিত্রের বলিয়া চিত্রিত করা হইতেছে অন্যদিকে রেলকর্ম্মচারীরাও যে কর্ত্তব্য বিষয়ে অমনোযোগী এবং কার্য্যক্ষম নয় তাহা প্রচার করার চেষ্টা হইতেছে। শেষোক্ত কারণ দেখাইয়াই ইতিমধ্যে ৫০ হাজার রেল শ্রমিক কর্ম্মচারী ছাঁটাইএর তোড়জোড় চলিতেছে। সরকারের এই ছাঁটাই নীতির বিরোধীতায় যদি রেল শ্রমিক কর্ম্মচারীরা সংগ্রামে নামে তখন যাহাতে তাহাদের পক্ষে জনসমর্থন পাওয়া সম্ভব না হয় সেই উদ্দেশ্যে রেলকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রচার চলিতেছে। বিরোধী দল এবং সাধারণ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নীতির সাফাই চলিতেছে পুরাদমে। তাই সাবোটাশ ও অমনোযোগীতার কথা বলার পরই আয়েঙ্গার মহাশয় বলিলেন—

( শেষাংশ ৭এর পাতায় দেখুন )

# দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিতে আনার চক্রান্ত

আজ পুঁজিবাদের ভবিষ্যত অনেকখানি নির্ভর করছে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার উপর। এই সব দেশে যে সাম্যবাদী আন্দোলন সুরু হয়েছে তাকে শুধু থামান নয়, ভেঙ্গে দিতে না পারলে ধনতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য—তা যেমন সত্যি এই সব দেশীয় ধনতন্ত্রের পক্ষে তেমনি তা সত্যি বিশ্বের ধনতন্ত্রের পক্ষেও। কারণ মার্কিনের একচেটে পুঁজির দিনে ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র বিশ্বের একচেটে পুঁজির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ইঙ্গমার্কিণ একচেটে পুঁজিবাদ যেমন দেশীয় পুঁজির রক্ষক তেমনি দেশীয় পুঁজিবাদও নিজ দেশে ডলার ষ্টার্লিং পুঁজিবাদের মাত্র বন্ধু। তাই এই সব অঞ্চলে দেশীয় পুঁজিবাদের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে একচেটে পুঁজিরও উচ্ছেদ হয়। আর যে সব দেশে বিদেশী পুঁজি সরাসরি শাসন করছে, সে সব দেশে আজকের সামাজিক শ্রেণী সমাবেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে সফলতা পুঁজিবাদের মৃত্যু ডেকে আনবে। তাই এই সব অঞ্চলে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী পুঁজির এক সাধারণ স্বার্থ রয়েছে এবং এই কারণেই দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় সমস্যা নিয়ে এত সব সম্মেলন। তারই অঙ্গ কলম্বোর পর সিডনী ও এর পর লণ্ডনইতে আগামী কমনওয়েলথ সম্মেলন। কলম্বো সম্মেলনের সব কিছুই ছিল কমনওয়েলথের দেশগুলিকে নিয়ে ব্রিটেনের নেতৃত্বে। অথচ, ব্রিটেন নিজেই মার্কিণ একচেটে পুঁজির আওতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কাজেই কমনওয়েলথের দেশগুলিকে সবদিক থেকে নেতৃত্ব দেওয়া তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া কমনওয়েলথের বাইরে এই দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় ফরাসী বা ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ রয়েছে। এই সব অঞ্চলে জনতার মুক্তির লড়াই চলছে। আর এই লড়াই যদি সফল হয়, কমনওয়েলথের দেশগুলি যতই তৈরী হোক না কেন, তবু তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে না। কাজেই কমনওয়েলথকে যেমন ঘাঁটি করতে হবে, তেমনি কমনওয়েলথের বাইরে এই দেশগুলির মুক্তির সংগ্রামকে ভেঙ্গে দিতে হবে। তাই অষ্ট্রেলিয়ার বিদেশী মন্ত্রী স্পেণ্ডার পরামর্শ দিয়েছিল কমনওয়েলথের দেশগুলিকে টাকার সাহায্য করলেই চলবে না, এর বাইরে সারা দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিকে সাহায্য করতে হবে। অবশ্য এ সাহায্য যে কি তাও কমনওয়েলথের সম্মেলনগুলিতে আলোচিত হয়েছে—অর্থাৎ সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য করতে হবে।

স্পেণ্ডারের এই পরামর্শকে কাজে লাগাবার জন্তেই এই সিডনী সম্মেলন হয়ে গেল। সাম্যবাদী আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্যে এদের দুটি পরিকল্পনা—একটি হচ্ছে যে সৈন্যসামন্ত আর গুলি-বারুদ এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে এই আন্দোলনকে মেরে ফেলা। তার জন্যে এই সব দেশকে ডলার ষ্টার্লিং, সৈন্য ট্যাংক দিয়ে সাহায্য করা আর যে সব দেশে মুক্তি যুদ্ধ ঠিক সুরু হয়নি, সেই সব দেশের জীবন ধারণের মান কিছুটা উন্নত করে সাম্যবাদের জোয়ারকে ঠেকানো। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় চীন ইন্দোচীন, মালয়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় সৈন্য সামন্তের কথা এসে পড়ে। কারণ এ সব দেশে সাম্রাজ্যবাদের ভিদে আর জোর নেই। কাজেই অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রশ্ন এখানে ওঠে না—এখানে প্রশ্ন হচ্ছে মুক্তি সংগ্রামকে যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়ে লুপ্ত সাম্রাজ্যকে ফিরিয়ে আনা। অথচ, এ আলোচনা আমেরিকাকে বাদ দিয়ে করা যায় না। তাই সিডনী সম্মেলনে সামরিক সাহায্যের কথা পাশ কাটিয়ে রাখা হয়েছে। অবশ্য সিডনী সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে লণ্ডনে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রীরা এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অর্থনৈতিক সাহায্যের আলোচনা সিডনী সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মার্কিণ একচেটে পুঁজিকে বাদ দিয়ে কোন পরিকল্পনাই নেওয়া যেতে পারে না। কারণ বিশ্বের বাজারের একচেটে মালিক সে। তাই, পাকিস্থান প্রতিনিধি আহমেদ খাঁ বলেন, "কমনওয়েলথের বাইরের দেশগুলির সহযোগীতা আমরা আন্তরিক ভাবেই চাই, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।" ভারতীয় প্রতিনিধি মুদালিয়ার বলেন, "আমরা আশা করি, যে যখন আমরা যথাসাধ্য করেচি তখন আমাদের এই সব অঞ্চলে যাদের একই স্বার্থ আছে, তারা যেন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। আর এই পথে উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে এসেছে মহান্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।"

এখন সমস্যা হচ্ছে, এই সাহায্য কি করে পাওয়া যায়। Import ও Export ব্যাংককে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে রাজী করানো যেতে পারে। অবশ্য Import ব্যাংক ইতিমধ্যেই ইন্দোনেসিয়াকে ১০ কোটি ডলার ধার দিয়েছে। চীনের জন্যে যে প্রায় ২০ কোটি ডলার মজুত ছিল, চীন সাম্যবাদী হয়ে যাবার পর সেই ডলারের কিছু অংশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে দেবার জন্যে রাজী করান যেতে পারে। অবশ্য গ্রিফিন মিশন ফেব্রুয়ারীতে এসে চীনের জন্যে মজুত ডলারের ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার দেবার সুপারিশ করে গেছে। কাজেই, সিডনী সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেমন করেই হোক্ আমেরিকার কাছ থেকে ডলার সাহায্য নেওয়া।

কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই সাহায্য পেলেও কি দেশের জীবন-মান উন্নত হবে? দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার এই সব দেশগুলিকে হয় দেশীয় বুর্জোয়ারা শাসন করছে, নইলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ গদীতে বসে আছে। কাজেই, এদের রাষ্ট্র কাঠামো ধনতান্ত্রিক, শাসক গোষ্ঠির কর্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষা। অথচ, বুর্জোয়ার স্বার্থ দেখলে শোষণকে সমর্থন করতেই হয়। কাজেই আমেরিকা যে সাহায্য এখানে করুক না কেন, তাতে জনসাধারণের অবস্থার এতটুকু হেরফের হয় না। কারণ, জীবন মান উন্নত করার নামে ঐ ডলার ধার নিয়ে নিজেদের মুনাফা লোটার কাজেই ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যে ডলার ধার দেবে তা সে নিঃস্বার্থ হয়ে দেবে না। সেই ধার দেওয়া ডলারের বদলে সে এই সব দেশের বাজারে তার মাল কাটতি করাবার চুক্তি করবে, সোবিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী ও নয়া-গণতন্ত্রী দেশগুলিকে মারবার জন্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি

( শেষাংশ ৭ম পাতায় )

# মধু ও হুল

পোড়া দেশের কপালে অনেক দুঃখ আছে বোঝা যাচ্ছে। আজও কিনা দেশবাসীরা মন্ত্রীদের মন যুগিয়ে চলতে শিখল না! আজকাল রেওয়াজ হয়েছে, কথায় কথায় সরকারের দোষ ধরা। পণ্ডিতজী এতে গোসা হয়ে বলেছেন, এ রকম বদঅভ্যাস ত্যাগ না করতে পারলে দেশের উন্নতি নেই; সরকার কি সব কাজ করতে পারে? জনসাধারণের কাজ জনসাধারণকেই করে নিতে হয়। এইটাই হল গণতন্ত্রের পরিচয়। সত্যিই ত, ভারতবর্ষ যখন গণপরিষদে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়েছে তখন তাকে সফলভাবে এগুতে হলে division of labour. শ্রম বিভাগের আশ্রয় নিতেই হবে। তাই ত পণ্ডিতজীর মত হল জনসাধারণের যে সব সমস্যা আছে, যেমন ভাত কাপড়ের সমস্যা থেকে শিক্ষার সমস্যা পর্য্যন্ত তা তাদের নিজেদেরই সমাধান করে নিতে হবে। আর তারপর বাকি যা থাকে, সেই মোটা টাকা মাইনে আর ভাতা বাবদে নেওয়া, মধ্যে মধ্যে বেতারের সাহায্যে বাতাসে বাণী ভাসিয়ে দেওয়া, উড়োজাহাজে করে স্বাস্থ্য ফেরাবার উদ্দেশ্যে আকাশে উড়ে বেড়ান, আর লোক দিয়ে লাঠি চালিয়ে মাথার খুলি পটাপট ফাটান, বুলেট মেরে রক্ত দিয়ে রাস্তার ধুলো মারা প্রভৃতি দরকারী কাজগুলি মন্ত্রীরা করবেন। আর তা ত তাঁরা করছেনই। এরপরও মন্ত্রীমণ্ডলী কিংবা সরকারের দোষ ধরলে রাগ ত হবারই কথা।

* *

বাংলা দেশে বড়বাজারের হাড়ে ভেল্কি খেলে। প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী গড়তে হবে; স্মরণ নেওয়া হল বড়বাজারের। শেঠজী তাঁর যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে সব পাকা ব্যবস্থা করে দিলেন। মন্ত্রীত্বের গদি যায় যায়; চলল ছোটাছুটি বড়বাজারে। লালাজী মুসকিল আসান রূপে আবির্ভূত হয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিলেন। আর ছোটখাট ব্যাপারের কথা না বলাই ভাল। বাড়ী গাড়ী আর ঐ জাতীয় যে জিনিষ না হলে মন্ত্রীত্ব আর বানপ্রস্থ এক হয়ে যায় সে সব ত হামেসাই আসছে বড় বাজারের অবতারদের কাছ থেকে। কলিতে যদি দেবমাহাত্ম্য কোথাও থাকে তা এই পীঠস্থানেই আছে। দেব, দ্বিজ দেবালয়ে ভক্তি হিন্দুদের অবশ্য কর্তব্য। তাই ত সম্প্রতি পশ্চিম বাংলা সরকার এই পীঠস্থানের এক দেবখিশেষের পৃষ্ঠ রক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছেন। শালওয়ালা চুনীচাঁদ কিষণ চাঁদের ওপর ৮৪ হাজার টাকা সেলসট্যাক্স ধার্য্য হয় হিসেব মতে। শ্রীকিষণ লালদীঘির পাড়ের বাসিন্দা ভক্তদের এ ধরণের বেইমানীর জন্য অনুযোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ৩০ হাজার

( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় )

# সোবিয়েতে অন্ধদের জন্য কি করা হয়

ডি, দেভিদফ্
সারারুশ অন্ধ সমিতির কেন্দ্রীয় পরিচালনা বিভাগের সভাপতি মণ্ডলীর উপসভাপতি

সোবিয়েৎ শাসন কায়েম হবার পর থেকেই সোবিয়েৎ রাষ্ট্র দৃষ্টিবিহীনদের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। যে কেউ কোন কারণে কাজের বার হয়ে যান তাঁকে আবার কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য সোবিয়েৎ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সমস্ত রকমের জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের এই হোল আদর্শ। সেইজন্যই অন্ধ এবং অন্যান্য পঙ্গুদের কাজের উপযুক্ত করে তোলার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্ধদের অন্তর্নিহিত সমস্ত গুণ, দক্ষতা ও সৃজনী শক্তিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সমস্ত রকমের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

রুশিয়ায় সোবিয়েৎ ব্যবস্থা চালু হবার পর প্রথম বছরেই কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সোবিয়েৎ সরকার অন্ধদের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে সারা রুশ অন্ধ সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সালের ২৩শে অক্টোবর মস্কোতে সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হয় এবং সমস্ত অন্ধদের নিয়ে একটি সংগঠন করার সিদ্ধান্ত করা হয় ও সেই অনুযায়ী নিয়মাবলী তৈরী হয়। নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে :—

(ক) সমস্ত অন্ধদের তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং তাদের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক কাজে লাগাতে হবে।

(খ) অন্ধদের কোন পেশা বা বিশেষ বিদ্যা শিক্ষার বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তরের অধীনে যে সব পঙ্গুদের সমবায় সমিতি আছে সেগুলিতে ভর্ত্তি করে দিতে হবে।

(গ) সমস্ত অন্ধদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্ত্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের পঙ্গুদের সমবায় সমিতির এবং শিল্পসমবায়ের সঙ্গে একসঙ্গে লাগতে হবে যাতে অন্ধদের জীবিকার ও সংস্কৃতি চর্চার উপায় হয়, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং ভবিষ্যতে লোকে যাতে দৃষ্টিশক্তি না হারায় তার উপায় হয়।

সোবিয়েতের সমস্ত সাধারণ তন্ত্রগুলিতেই অন্ধ সমিতি গড়া হয়েছে। সমিতিগুলি থেকেই সদস্যদের কাজ দেবার ব্যবস্থা হয়। সরকারী সমবায় শিল্পে, সরকারী ও যৌথ খামারে বহু অন্ধেরা কাজ করেন। টার্নিং, গ্রাইণ্ডিং, ড্রিলিং, ফিটিং, বোনা, সুটকেশ তৈরী করা, কাঠের কাজ, ইত্যাদি প্রায় ৫০০ রকমের কাজে অন্ধদের দেখতে পাওয়া যাবে।

যুদ্ধে, দুর্ঘটনায় যাঁরা চোখ হারিয়েছেন এবং জন্মান্ধ ও অন্যান্য অন্ধদের কাজ শেখাবার জন্য ২০০ প্রতিষ্ঠান আছে অন্ধ সমিতির। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সরকার কোন কর আদায় করেন না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অন্ধেরাই ইলেকট্রিক ভেন্টিলেটার, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি নানা দরকারী জিনিষ তৈরী করেন। শত শত অন্ধ অসাধারণ কেরামতি দেখিয়ে "স্তাখানফপন্থী" হিসাবে নাম কিনেছেন এবং তাঁদের কর্মসূচীর চেয়ে অনেক বেশী (দ্বিগুণ পর্যন্ত) উৎপাদন করছেন।

অন্ধেরা সরকারের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থসাহায্য পেয়ে থাকেন, বাড়ী তৈরীর জন্য ঋণ পান। মাত্র তিন বছরে কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে অন্ধদের সাহায্য হিসাবে মোট ৫০ লক্ষেরও বেশী রুবল দেওয়া হয়েছে। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে সমস্ত অন্ধ শিশুদের এভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক সাত-সালা ও মাধ্যমিক শিক্ষা অন্ধ শিশু ও কিশোরেরা অন্য সাধারণ ছেলেদের মতই পায়। সেখানেই তারা কোন না কোন কাজ করতে শেখে। তাদের শিক্ষা, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সমস্ত খরচ সমাজতন্ত্রী সরকারই দেন, তাদের পুঁজিবাদী দেশের মত মা-বাপের পয়সার ওপর বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের খয়রাতির ওপর নির্ভর করতে হয় না।

কম্যুনিষ্টপার্টি ও সোবিয়েৎ সরকারের কল্যাণে অন্ধের পড়ার জন্য বড় বই ছাপা হচ্ছে। রুশ ফেডারেশনের পাঠ্য বই প্রকাশ প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার বই, উপন্যাস, রাজনৈতিক সাহিত্য, এবং গানের বই 'ব্রেইল' অক্ষরে ছাপা হয়। মস্কোর একটি বিশিষ্ট ছাপাখানায় (Glavpoligrafizolat) প্রতিবছর "ব্রেইল" ভাষায় তিন কোটি পর্যন্ত ছাপা হয়। অন্ধদের জন্য রুশিয়ার ৮টি মাসিকপত্র বেরোয় যাতে অন্ধেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ওপর প্রবন্ধ লেখেন, আলাপ আলোচনা করেন।

অন্ধ প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য সোবিয়েৎ রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ রুবল খরচ করে। তাদের জন্য অসংখ্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রমোদভবন রয়েছে। সেখানে নাচ, গান, নাট্য ইত্যাদি হয়ে থাকে।

সোবিয়েতের সমস্ত নাগরিকেরাই আজ লিখতে পড়তে জানেন। অন্ধেরা পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষিত হতে চলেছেন। সম্প্রতি ১৫০০ জন অন্ধ ছাত্র উচ্চশিক্ষা-লাভ করছেন; বহু অন্ধ শিক্ষক এবং বিজ্ঞান কর্মী হতে পেরেছেন।

অন্ধদের কাছে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির জীবনী হোল জলন্ত দৃষ্টান্ত। অস্ত্রোভস্কির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির সেবার জন্য তিনি সমস্ত বাধাবিপত্তিকে পরাজিত করেন।

অন্ধ অধ্যাপক লেভ সেমেনোভিচ পাত্রয়াগিন সোবিয়েৎ বিজ্ঞান মন্দিরের "করেসপণ্ডিং মেম্বার" এবং গণিতে তিনি স্তালিন পুরস্কার পেয়েছেন। ইতিহাসের অধ্যাপক "বচ্‌কারফ্" মাননীয় বিজ্ঞানকর্মী উপাধি" পেয়েছেন। তিনিও অন্ধ। বিয়াজান্তসেফ্, আসাদফ্, স্তুরগফ্, দব্রঝিন্‌স্কি, বেলোরুকফ্ ইত্যাদি অন্ধ লেখক ও কবি রয়েছেন।

মহান মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধের সৈনিকদের সোবিয়েতের মানুষ অসাধারণ শ্রদ্ধা করে। যুদ্ধে যাঁদের চোখ খোওয়া গিয়েছে তাঁরাও আবার সাম্যবাদী সমাজ গড়ার কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠছেন। চোখ নষ্ট হবার পরে টি, তিয়োমিরফ্ ভূতত্ত্বে ডক্টরেট পেয়েছেন। আরো অনেকে নানা দরকারী কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। সরকার ও পার্টি ছাড়াও সোবিয়েতের বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকেরা চক্ষুহীনের চোখ ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

বিপ্লবের আগে চক্ষুহীনদের অবস্থা দাঁড়াত বুর্জোয়া সমাজের সৎছেলের মত উপেক্ষিত। আজ আর সেদিন নেই। ১৯১০ সালে রুশিয়ার এক বিশিষ্ট চক্ষুবিৎ বলেন যে "শতকরা ৬০টি ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়। সুতরাং এই ভয়ানক কথা মানতে আমরা বাধ্য যে অকারণেই জ্ঞানের আলোর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের অন্ধদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন দৃষ্টিশক্তি হারায়।

ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার জন্য পুরানো দিনের রুশিয়ায় বহু রোগী নানা রোগে ভুগে শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যেত। আজ সোবিয়েতের চিকিৎসার জন্য মানুষকে গাঁট থেকে পয়সা খরচ করতে হয় না বলে সমাজতন্ত্রী সমাজের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলেই যথাসময়ে চিকিৎসা পান এবং অনেকেই সেরে ওঠেন।

ফিলাতফ পরীক্ষামূলক চক্ষুগবেষণাগারে একাডেমিসিয়ান ফিলাতফ এবং তাঁর ছাত্রেরা হাজার হাজার অন্ধ শ্রমিক, কৃষক, সাহিত্যিক, এঞ্জিনিয়ারকে অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসকের চোখ ফিরিয়ে দেন।

সোবিয়েতের মানুষ দুর্ভাগ্য অন্ধদের সাহায্য করে প্রাণ দিয়ে যাতে তারা আবার সমাজতন্ত্রী সমাজের কর্মী হয়ে ফিরে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। —টাস

শোষিত মেহনতকারী জনতার
একমাত্র সাপ্তাহিক
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দি মুখপত্র
হামারা পথ
কার্য্যালয় ঃ—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

# চিঠিপত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন )

## দুই দুনিয়ার দুই রূপ

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,—

বহু প্রশংসিত আপনার পত্রিকায় নীচের খবরটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি।

জনকল্যাণী কংগ্রেসী সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর মাইনে কয়েক হাজার টাকা। এছাড়া ডেপুটি মন্ত্রী, সেক্রেটারী করে মোটামোটা টাকার মাইনে আর ভাতা পাওয়া অফিসাররা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে মূর্খতাকে ঘুচিয়ে ফেলতে। তা ছাড়া মাঝে মাঝে সম্মেলন বসছে, কয়েক হাজার টাকা তার জন্য খরচ হল। মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে প্লেনে, স্পেশ্যাল সেলুনে ঘুরে ঘুরে দেখে শুনে আসছেন, তার জন্যে মোটা মোটা টাকার খরচ। তারপর মূর্খতা ঘোচাবার জন্যে একটা প্ল্যান করতে হবে, তার জন্যে একটা কমিটি বসল, সেখানে আবার মোটা টাকা খরচ। জনসাধারণের টাকা নিয়ে এমনি করে ছিনিমিনি খেলেও দেখা গেল মূর্খতা আর ঘুচল না, বরং এই সব পরিকল্পনায় মূর্খের সংখ্যা বাড়িয়ে যাবার চেষ্টা আছে। তার সাম্প্রতিক প্রমাণ এখানে—পূর্ব্বাংলা থেকে অসংখ্য বাস্তুহারা চলে আসার পরে এখানে ছাত্রের সংখ্যা গেছে অনেকগুণ বেড়ে। এখানে মূর্খতা ঘোচাতে গেলে স্কুল কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি করার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। অথচ, তার বদলে ডি, পি, আই-র নির্দ্দেশে স্কুল কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় ভর্ত্তি করা হবে পরীক্ষা করে। অর্থাৎ, কর্ত্তাদের পেটোয়া ছাড়া, আর পয়সাওয়ালা দুচারজন ছাড়া আর কারুর ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাবে না। কাজেই, কংগ্রেসী নেতারা মূর্খতার বিরুদ্ধে যত বক্তৃতাই দিন না কেন, প্রকৃতপক্ষে মূর্খের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু, ভিয়েৎনামের মত ছোট দেশ, যেখানে সমাজতন্ত্র আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, হো-চীন-মিন্ এখনও দেশ গড়ার কাজে সমস্ত শক্তি দিতে পারছে না, তবু সেখানে মূর্খতার হার ৪৫ সালের ৮০%—৯০% থেকে ২০% নেমে এসেছে। এই হিসাব সাম্যবাদ বিরোধী বিদেশীদেরই মতে। ভিয়েৎনামের "ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক" তার শাসনতন্ত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও বিনা পয়সায় করে ফেলেছে। কিন্তু, ভারতবর্ষের জনকল্যাণী নেতারা বেশ গুছিয়ে বসেও এই ব্যবস্থাটি আজও শেষ করতে পারলেন না। ৪৩ সালেই সরকারী নির্দ্দেশে ভিয়েৎনামের গ্রামে গ্রামে গণ কমিটীগুলি মূর্খতা দূর করার কাজে লেগে পড়ে। পরে গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে প্রতিযোগীতা লড়িয়ে মূর্খতা ঘুচিয়ে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এইভাবে ৪৮ সালে ভিয়েৎনামের অনেকগুলি জেলায় মূর্খতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কোথাও কোথাও মাত্র বারো পারসেন্টে নেমে আসে। চীনেতেও ঠিক একই ইতিহাসের ধারা।

কাজেই, দেখা যাচ্ছে, জনতার শিক্ষা দূর করার কার্য্যকরী পদ্ধতি নেওয়া সম্ভব একমাত্র সমাজতন্ত্রেই, যেখানকার রাষ্ট্র জনতার, জনতার স্বার্থ বজায় রাখাই যার উদ্দেশ্য। তাই ভারতবর্ষের ধনবাদী রাষ্ট্রে শিক্ষা পাওয়া যেখানে বড় বড় পুঁজিপতিদেরই একচেটে হয়ে যাচ্ছে, সেখানে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামী ভিয়েৎনামে, চীনে শিক্ষায় সমস্ত জনসাধারণের অধিকার এসে গেছে। কাজেই মুক্তি যদি পেতে হয়, দেশের সমস্ত মানুষকে যদি আজ শিক্ষিত করতে হয়, শ্রমিক শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের লড়াইকে, তার প্রস্তুতিকে জোরদার করে তুলতে হবে। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

**ফজলুর রহমন**

---

প্রত্যেকটি প্রদেশ, জিলা, ইউনিট ও প্রত্যেকটি সভ্যকে ও 'গণদাবীর' গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁদের কাছে পত্রিকার যে টাকা পয়সা পাওনা আছে, তা কালবিলম্ব না করে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

**রথীন সেন,**
ম্যানেজার, গণদাবী,
৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১৩

---

# উদ্বাস্তুদের প্রতি কংগ্রেসী দরদের নমুনা

### ৫ দিন অনাহারের পর এক ব্যক্তির মৃত্যু
### ৩ বৎসরের শিশুর আহার বন্ধ করাইয়া হত্যা
### উদ্বাস্তুদের উৎখাত করিয়া পুলিশ কর্ত্তার ভ্রাতাকে বাড়ী দান

উদ্বাস্তুদের প্রতি কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের আসল মনোভাবের পরিচয় বহুবার আগেই পাওয়া গিয়াছে। আমরা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি কংগ্রেসী সরকার উদ্বাস্তুদের প্রকৃত ভাল করিতে চায় না এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া ভাল করিতে পারেও না। তবুও মাঝে মাঝে নেতাদের আপাত দরদী কথাবার্ত্তা ও চোখের দুই চার ফোঁটা জল দেখিয়া যাঁহারা ভাবেন সরকার বাস্তুহারাদের সকল সমস্যার সমাধান করিবে তাঁহাদের নীচের ঘটনাগুলি দেখিয়া মোহ ত্যাগ করা উচিত। পাছে বাস্তুহারার দলের কংগ্রেসের প্রতি মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, পাছে তাহারা নিজেদের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার অধীনে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তুলে এই ভয়ে বহু কংগ্রেসী মাতব্বর ব্যক্তি উদ্বাস্তুদের ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে এবং সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করিতে উপদেশ দিতেছে। ইহা নিছক কংগ্রেসী দালালী ভিন্ন আর কিছু নয়। ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী সরকার যেমন একদিকে নিছক দমন নীতির জোরে লাঠি, গুলি, গ্যাস ও বেআইনী আইন দিয়া বাস্তুহারাদের জব্দ করিতেছে তেমনি যাতে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া সরকারের বাস্তুহারা নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন দালাল দিয়া তাহাদের ঐক্যবদ্ধতা ভাঙ্গিয়া দিবার ও ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করিতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কংগ্রেসের শেষোক্ত ভূমিকাই পালন করিতেছেন। বাস্তুহারাদের প্রতি তাঁহার একমাত্র উপদেশ, ধৈর্য্য ধর ও সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন কর।

আবেদন নিবেদনে কিছু হয় না। বরং তাহাতে অত্যাচার ও দুঃখ বাড়িয়া চলে। নেতাদের এই 'ধৈর্য্য ধর' নীতির জন্যই নদীয়া জিলার তেহট্ট থানার গ্রামগুলিতে উদ্বাস্তুদের শোচনীয় অবস্থায় চরমে উঠিয়াছে। গত ৪ঠা মে রাধানগর পল্লীতে তপন সাহা নামক জনৈক উদ্বাস্তু অনুনয় বিনয় করিয়া সরকারের কৃপা লাভে অক্ষম হয় এবং এক মুঠা চাউল ও পাঁচদিনের মধ্যে জোগাড় করিতে সমর্থ হয়। অবশেষে পাঁচ দিন অনাহারের পর তাহার মৃত্যু ঘটে।

এইরূপ অন্যত্রও হইতেছে। ইলাহানীর পাটের গুদামে ৪০টি বাস্তুহারা পরিবারের ২৫০ জন লোককে গুদামজাত করা হইয়াছে। ইহাকে বলা হইয়াছে কাশীপুর বাস্তুহারা শিবির। আসলে ইহা বাস্তুহারা শিবির নয়, বাস্তুহারা মারা শিবির। গত একমাস ধরিয়া কয়েকটি সেবা সমিতি বাস্তুহারাদের খাওয়াইতেছিল কিন্তু সম্প্রতি একমাত্র সরকার অনুমোদিত কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি U. C. R. W. ( কাটজু কমিটি ) সেবা সমিতিগুলিকে নাকচ করিয়া দিয়াছে। ফলে উহারা সেবা কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। একদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য বন্ধ অন্যদিকে সরকার কর্ত্তৃক কোন সাহায্য না আসায় ৪০টি পরিবার আর অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। এই অনাহারের ফলেই একটি তিন বৎসর বয়স্ক শিশু মারা পড়িয়াছে। ইহাকে শিশুহত্যা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না।

কলিকাতার মুসলমানপাড়া লেনের একটি বাড়ী হইতে তিনটি উদ্বাস্তু পরিবারকে বলপূর্ব্বক অপসৃত করিয়া সেই বাড়ীতে মধ্যকলিকাতার জনৈক পুলিশ কর্ত্তার ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। টাকা দিয়া উপযুক্ত দলিল নেওয়া সত্ত্বেও বহু উদ্বাস্তুকে জোর করিয়া বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করা হইতেছে। ধনী বাড়ীওয়ালারা ও কংগ্রেসী সরকার এই অভিযান এখন পুরাদমে চালাইতেছে। ফ্যাসীবাদী কংগ্রেসী সরকারের উদ্বাস্তুদের উপর জুলুমের হাজার হাজার উদাহরণ আছে। ইহাকে রোধ করিতে হইলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িতে হইবে। তাহার চেষ্টাই কর্ত্তব্য।

# উত্তর প্রদেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা

## প্রতি মণ চাউলের দাম ৪০ টাকা

### তিন দিনে মাত্র একবার আহার

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত, জনসাধারণের কোন দুঃখ কষ্ট সেখানে নাই বলিলেই হয়, এই ধরণের দাবী কংগ্রেসী নেতৃকর্ত্তারা প্রায়ই করিয়া থাকেন। অথচ কংগ্রেসী স্বর্গের ভিতর জনসাধারণ কি সুখে আছে তাহার প্রমাণ কয়েকদিন আগেও মিলিয়াছিল বলিয়ার চাষীদের উপর গুলি চালনা হইতে। শুধু গুলি চালনাই নয়; না খাইতে দিয়া মারিবার চেষ্টাও চলিতেছে। উত্তর প্রদেশে জমিদারী যায় যায়; নেহাৎ জনসাধারণ জমিদারদের যে কয়েক কোটি টাকা খেসারত দেওয়া হইবে তাহা আজও দিয়া দেয় নাই বলিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপ হয় নাই; আর তাহা না হইলেও চাষীদের কোন অসুবিধা নাই, তাহারা স্বর্গসুখে বাস করিতেছে—এ কথা বহুবার শোনান হইয়াছে। অথচ মন্ত্রীদের বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন ও বন্ধু শ্রীগোবিন্দ নিজে ৪০টি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন যে, "বলিয়ারি খাদ্যাবস্থা চূড়ান্ত রকমে খারাপ। যেখানেই আমি গিয়াছি সেইখানেই চাষীদের নিকট হইতে একই কথা শুনিতে হইয়াছে, তিন দিনের মধ্যে তাহাদের একবার আহার জোটে। যতদিন ক্ষেতে মটর ছিল ততদিন কোন রকমে সেই মটর তুলিয়া তাহারা উদর পূর্তি করিয়াছে। আজ মটরের সময় নয় এবং কেনার মত অবস্থা না থাকায় তাহাদিগকে উপবাস করিয়া কাটাইতে হইতেছে।"

আজমগড়, গাজীপুর ও জৌনপুর জিলারও এই এক অবস্থা। চাউল ৪০৲ এবং ভুট্টা ৩০৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। ইহার সহিত নূতন ভাবে আরম্ভ হইয়াছে জমিদারের জুলুম। যেখানে শতকরা ৬০ জন চাষীর জমিই নাই সেখানে আবার চাষীকে জমি হইতে উৎখাত করা হইতেছে তাহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার সুযোগ লইয়া। ইহার প্রতিবাদেই কয়েক মাস আগে বলিয়ার কৃষক সম্প্রদায় সভা করিয়াছিল। কিন্তু জমিদার বন্ধু পন্থসরকার সে সভার উপর নির্বিচারে গুলি চালাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে বলিয়ার চাষীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কংগ্রেসী সরকার আজও নিজেদের কাজে লাগায় প্রচারে অথচ গুলি চালাইয়া, তাহাদিগকে না খাইতে দিয়া তাহাদিগের বিপ্লবী মনোভাব ভাঙ্গিবার চেষ্টা চলিতেছে। তবে ইহাও ঠিক কোন দেশেই গুলি ও গ্যাসের জোরে গণঅভ্যুত্থানকে রোধ করা যায় নাই এখানেও যাইবে না। উত্তর প্রদেশের চাষীরা নিজেদের সেই উদ্দেশ্যেই ঐক্যবদ্ধ করিতেছে।

# পুঁজিবাদী দেশগুলির শান্তির পরিচয়

### সামরিক খাতে মোট খরচের অর্দ্ধেকের বেশী বরাদ্দ

### জনউন্নয়ন পরিকল্পনায় খরচের পরিমাণ নগণ্য

ইঙ্গমার্কিণ পুঁজিবাদীচক্র বিশ্বশান্তি রক্ষার চেষ্টা করিতেছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন জগতের মধ্যে একমাত্র আক্রমণকারী শক্তি, এই কথা প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে উগ্ররূপে প্রচারিত হইতেছে। ভারতবর্ষও তাহার ব্যতিক্রম নয়। সরকারী প্রচার বিভাগ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে এই জঘন্য মিথ্যা প্রচার করিয়া নেহেরুর নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতেছে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আদেশে স্কুল কলেজগুলিতেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সোভিয়েট বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে। এই সব জনশত্রুদের ধারণার সহিত হিটলারের প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবল্‌সের ধারণার কোন প্রভেদ নাই। কর্ম্মপন্থা ইহাদের—মিথ্যা অনবরত বলিয়া যাও, জনসাধারণ কিছু-দিন বাদে তাহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে। তাই জনসাধারণের সম্মুখে আসল অবস্থা প্রকাশ করিতে ইহারা সাহস পায় না কারণ প্রকৃত খবর জানিলে জনতা শান্তির রক্ষক হিসাবে সোভিয়েটের পাশে দাঁড়াইবেই দাঁড়াইবে। পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজেট তাহাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির সাক্ষ্য দিবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে এটম বোমা তৈয়ারী, সৈন্যরক্ষা প্রভৃতি সামরিক বিষয়ে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩২০০ কোটি ডলার; অর্থাৎ মোট বাজেটের শতকরা ৭০ ভাগ। অথচ শিক্ষাখাতে শতকরা ১ ভাগেরও কম, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি জনউন্নয়নকর বিভাগে শতকরা ৬ ভাগের মত ব্যয়িত হইবে।

গ্রেটবৃটেনের সামরিক ব্যয় মোট বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ, ফ্রান্সে ৩৫ ভাগ এবং ইতালিতে ৩৩ ভাগ।

ভারতবর্ষও পিছাইয়া নাই। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট অনুসারে সামরিক খাতে ব্যয়িত হইবে ১৬৮·০১ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ; অথচ শিক্ষা, কৃষি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্বাস্থ্য বিভাগে শতকরা ৪ ভাগ, শিল্পোন্নতির জন্য শতকরা ২ ভাগ।

আর সোভিয়েটে ইউনিয়নে খরচ করা হয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ১৮৯·৯, সামাজিক কাজে ১১৯·২ এবং সামরিক খাতে ৭৯ বিলিয়ন রুবল। অর্থাৎ সামরিক খাতে যত ব্যয়িত হয় তাহার দেড়গুণেরও বেশী খরচ করা হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নতিকর বিষয়ে। অবশ্য ইহার মধ্যে ১৮৯৯০০ কোটি শিল্প এবং কৃষির জন্য অনুরূপ ব্যয় ধরা হয় নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ মোট খরচের শতকরা ৯ ভাগ, শিক্ষাখাতে ১২ ভাগ, স্বাস্থ্যখাতে ২৬·৩ ভাগ, এবং অর্থনৈতিক খাতে ৩২ ভাগ।

বুলগেরিয়াতেও তদ্রূপ। সামরিক খাতে খরচ সেখানে মোট বাজেটের শতকরা ৭ ভাগ, অথচ সংস্কৃতিমূলক কাজে খরচ ৩০ ভাগ।

ইহা হইতেই প্রমাণ হয় কাহারা যুদ্ধ বাধাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

# মধু ও হল

( ২য় পৃষ্ঠার পর )

টাকা মাপ হয়ে গেল। কারণ এত ট্যাক্স দিতে গেলে নাকি বেচারী দুনীচাঁদের কষ্ট হবে। আহা কি উদার প্রাণ। আর হবেই না বা কেন? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে অর্জ্জুন উৎরে গেলেন যখন, তখন কিষাণ চাঁদের সাহচর্য্যে লালদীঘির কর্ত্তাদের মন উদার হবে না? বিশেষ করে দুনীচাঁদ কিষণচাঁদদের যখন দুনিয়াজয়ী রূপচাঁদ আছে। রায় পরিবারের এই কৃষ্ণপ্রীতিতে দিল্লীর গান্ধীপন্থী বৈষ্ণব কুল নিশ্চয় খুসী হবেন।

* *

মার্কিণের ভূতপূর্ব সভাপতি হুভার সাহেব এক বক্তৃতায় বলেছেন, গোটা পৃথিবী দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে; তার একদিকে আছে শোষক অত্যাচারীরা অন্যদিকে আছে স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রীরা। অবশ্য তাঁর মতে ইঙ্গমার্কিণ গোষ্ঠীই হল সারা বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষাকারী। এতে অবাক হবার কিছু নেই। গল্পে আছে, এক বাঘকে মানুষের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে বলায় সে লেখে, মানুষ অতি হিংস্র জন্তু, দেখিবামাত্রই বাঘকে আক্রমণ করে। মোট এগারটা পরিবার যেখানে গোটা আমেরিকার জনসাধারণের রক্ত চুষেও তৃপ্ত না হয়ে পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশী লোককে তার জাঁতা কলে পিষছে সেই পরিবারভুক্ত লোক হয়ে যদি হুভার সাহেব এ কথা না বলেন তাহলে চন্দ্রসূর্য্যই মিথ্যা হয়ে যাবে। তবে ব্যাপার হল, colour blindরা এক রংকে অন্য রং দেখলেও সাধারণ মানুষ খাঁটী রং চিনতে ভুল করে না।

* *

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে? ক্ষিতীশ নিয়োগী মশাইও মন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর বলে বসলেন, আর রাজনীতি করব না। আমরা ত শুনে অবাক হচ্ছি, নিয়োগী মশাই আবার রাজনীতি করলেন কবে যে এখন আর করবেন না বল্লেন। বৃটীশ আমলে দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানগিরি করে প্রজা ঠেঙান নয় আইনের পরামর্শ দিয়ে রাজা রাজড়াদের মন যুগিয়ে চলা আর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বড় সাহেব বেঙ্গল ওয়াকারদের শ্রীপদে ধানিজাত দ্রব্য বিশেষ প্রদান করে ত তাঁর পদোন্নতি। এর কোন জায়গায় রাজনীতি? তবে, রাজনীতি হল সেই রাজ যার কোন নীতি নেই, বীরবলের এই সংজ্ঞা অনুসারে যদি রাজনীতির মানে নীতিহীনতা হয় তাহলে আমরা অস্বীকার করব না তাতে তিনি বর্ত্তমান মন্ত্রীদের কারও চেয়ে কম যান না। এ ধরণের রাজনীতি থেকে তিনি যদি সরে থাকতে পারেন তাহলে বাংলাদেশ একটা কুগ্রহ থেকে বাঁচল বলতে হবে।

# শিল্প জাতীয়করণের নামে পুঁজিপতি আর মন্ত্রীদের উদর পূর্তি

( ১ম পাতার পর )

রাজত্বের আমল ; সুতরাং সেখানে যদি লালা শ্রীরামের বেশ দুই চার কোটি টাকা সুবিধা না হয় তাহা হইলে নাম ধারণের মাহাত্ম্য থাকে কোথায়? সুগ্রীব ও হনুমানের দলই যখন দুই হাতে টাকা লুঠিতেছে তখন শ্রীরাম ত লুঠিবেনই। সুতরাং ৬০ লক্ষ সরকারী টাকা ঢালা হইল উড়িষ্যা টেক্সটাইল লিমিটেডের পিছনে। এই টাকার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনিয়াছে উড়িষ্যার প্রাদেশিক সরকার এবং বাকি ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর হইয়াছে। ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের চাহিদা আছে নিঃসন্দেহ কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহা অত্যাবশ্যকীয় কিনা তাহা বিবেচ্য। বিশেষতঃ উড়িষ্যায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স পাইয়াও বিড়লা লাইসেন্স প্রত্যর্পন করিয়াছিলেন লাভজনক বে না দেখিয়া। এ হেন অবস্থায় যে কোম্পানীর মোট বিক্রীত শেয়ারের মূল্য সরকারী ২০ লক্ষ টাকা ধরিয়া ৫০ লক্ষ মত তাহাকে ৪০ লক্ষ ঋণ দেওয়া কোনমতেই চলে না যেহেতু প্রাথমিক খরচ হিসাবেই কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া যায় ; ফলে এক্ষেত্রে মূলধন ঋণের সমান প্রায় হইবে। তবুও ঋণ মিলিল। তাহার কারণ মিলটির ম্যানেজিং এজেন্টের দুই জন অংশীদারের মধ্যে একজন হইলেন শ্রীরামের আত্মীয় শ্রীপ্রতাপ সিং।

উড়িষ্যা টেক্সটাইল লিঃ ব্যতীত শ্রীরামের স্বার্থ বেঙ্গল পটারিজ ও সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ এর সহিত জড়িত। সুতরাং তাহাদের ভাগ্যেও বেশ কিছু জুটিয়াছে। টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি নির্মাতা একটি কোম্পানীর বরাতে মিলিয়াছে ৪৩ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষে টেক্সটাইল মেসিনারি নির্মানকারী দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে—একটি বিড়লার টেক্সম্যাকো অন্যটি লালা শ্রীরামের। বিড়লা কোম্পানী, শোনা যাইতেছে, বর্ত্তমানে আর নিজেরা যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবে না যেহেতু বাজারে তাহাদের মাল কাটতি হইতেছে না এবং তাহার পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থান মোটর মেসার্স বিলাতী মরিস মোটরের উপর ভারতীয় ছাপ সেইরূপ বিলাতের ব্যাবকক উইলকক্স কোম্পানীর মাল ভারতবর্ষে assemble, অর্থাৎ লাগাইয়া দেশী মাল হিসাবে চালাইবে। তাহা হইলে দেখা গেল যাহাকেই দেওয়া হউক, হয় শ্রীরাম-চন্দ্রের উদর পূরণ করা হইয়াছে নয় এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হইয়াছে যাহারা ভারতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক এবং তাহার নাম করিয়া কাষ্টম ডিউটি প্রভৃতি এড়াইয়া বিলাতী জিনিষ দেশী হিসাবে চালাইয়া প্রচুর লাভ করিতে সচেষ্ট।

কিন্তু শুধু শ্রীরামকে ধরিলেই বা হইবে কেন? প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরাও লক্ষ লক্ষ টাকা হাতাইয়া লইবার এমন সুযোগটি বৃথাই বহিয়া যাইতে দিতে পারেন না। আপাততঃ যে দুইজনের নাম জানা গিয়াছে তাঁহারা দেশের জন্য মল ও মূত্র ত্যাগ ব্যতীত অন্য কিছু ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তাঁহাদের এই বিরাট ত্যাগের পুরস্কার হিসাবে ইংরাজ সরকারের তাঁহারা অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সেই কারণে তৎকালে মন্ত্রীত্বপদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন বটে, অবশ্য তাঁহাদের প্রভুপ্রীতির জন্য কংগ্রেসী মহলে তাঁহাদের খাতির কিছু কমে নাই। এই দুই পূজনীয় ব্যক্তির একজন হইতেছেন পশ্চিমবাংলার অর্থসচিব সরকার মহাশয় অন্যজন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী নিয়োগী সাহেব। এই দুই মহারথীর স্বার্থ জড়িত আছে মেটাল করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার সহিত। অতএব হিসাবপত্রের গোলমালের জন্য প্রথমবার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলেও রাতারাতি তাহা নির্ভুল হইয়া যায় এবং তাহাদের কপালে বেশ কয়েক লক্ষ জুটিয়া গেল। ইহা ছাড়া জানা গিয়াছে একটি তেলের কলকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা ভেজিটেবল অয়েলের কারখানা হইবে ; কারণ অনেক মহারথীরই এই বনস্পতির ব্যবসা আছে। তবে যে তেলই হউক না কেন তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসী রাজত্বে তেলের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; তৈলপ্রদানে হয় না এমন কাজই নাই। সুতরাং তেলের ব্যবসায়ে ঋণ ত দিতেই হইবে।

এইভাবে প্রথম বৎসরেই ২১ টি কোম্পানীকে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। বিলটি গণপরিষদে আনিবার সময় গলাবাজি করিয়া বলা হইয়াছিল ভারতবর্ষে শিল্প জাতীয় করণের পরীক্ষা হিসাবেই এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন আরম্ভ করা হইল। জাতীয় করণের চমৎকার নমুনা মিলিয়াছে! ইহার পর যদি এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাজে কোম্পানীকে ধার দেওয়ার জন্য অহেতুক ঝুঁকি লইতে হয় ও তাহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সরকারকে গ্যারেন্টি মাফিক সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে হয় তাহা হইলে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করা যাইবে। সে উদ্দেশ্য যে নাই এমন নয়। জনসাধারণ বার বার শিল্পগুলি জাতীয় করণের দাবী করে, তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিতে হইলে যদি তাহাদেরই রক্তে অর্জিত ৫ কোটি টাকা বড়লোকের পকেটে উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহা করিতে হইবে। কংগ্রেসী সরকার সে ব্যবস্থা পাকা করিয়া রাখিয়াছে। বিলাতেও শ্রমিক সরকারের অধীনে পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাঁচাইবার জন্য যে শিল্পগুলি লাভজনক ছিল না সেইগুলিকে সরকার কিনিয়া লইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন ধনিক গোষ্ঠি তাহাদের পুঁজির পাঁচ সাতগুণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইয়াছে তেমনই অন্যদিকে শিল্পগুলির পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইয়া মাসে মাসে মোটা বেতন ও ভাতা লুঠিতেছে। এই কারণেই বিলাতের পুঁজিপতিরা বিলাতের শ্রমিক দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভারতবর্ষেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্রাথমিক চেষ্টা হইল এই করপোরেশন। ইহার নাম না জাতীয়করণ না ঐ জাতীয় কিছু। যদি সঙ্গত কোন নাম দিতেই হয় তাহা হইলে ইহাকে বলিতে হয় চোরপোষণ।

প্রকৃত জাতীয়করণ ঐ ভাবে হয় না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্পগুলি জাতীয়করণ হইলেও জনতার দুঃখ দূর হয় না। হিটলারের নাৎসী জার্মানীতে শিল্পের জাতীয়করণ হইয়াছিল। তাহাতে জনতার কোন লাভ হয় নাই। নাৎসী জার্ম্মানীর কথা ছাড়িয়া দিলেও সমাজতন্ত্রী লেবার সরকার ইংলণ্ডে কয়েকটি শিল্প জাতীয়করণ করিয়াছে। তাহাতে সাধারণ মানুষের আশান্বিত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। বরং পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা খেসারৎ জোগাইতে হইয়াছে জনসাধারণকেই। বিপ্লবের মারফৎ জনরাষ্ট্র কায়েম করিতে পারিলে তবেই তখন প্রকৃত জাতীয়করণ সম্ভব। জনতার দুঃখ দুর্দশা দৈন্য বেকারত্ব তখনই কেবল-মাত্র দূর হইতে পারে। জোড়াতালি কাজে কিছু হইবে না ; যেহেতু এই জোড়াতালির উদ্দেশ্য পচা ভাঙ্গিয়া পড়া ধনতন্ত্রকে আরও কয়েক বৎসর বাঁচাইয়া রাখা। সুতরাং কংগ্রেসী সরকারের এই ধরণের কোটি কোটি টাকা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলুন, উহার বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন গড়িয়া তুলুন, নিজেদের সংগঠিত করুন, দেশের বিভিন্ন দলের মধ্য হইতে খাঁটী বিপ্লবী দলকে বিচার করিয়া চিনিয়া লউন, সর্বশক্তিতে সেই দলকে শক্তিশালী করিয়া বিপ্লবী প্রস্তুতি গড়িয়া তুলুন। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সেই আহ্বানই দিতেছে।


সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির নির্ভুল বিশ্লেষণ

মানুষের মত বাঁচার পথ

জানিতে হইলে

সোভিয়েট ল্যাণ্ড

পড়ুন

অনুসন্ধান করুন :—টাস নিউজ এজেন্সি, ৬, ক্যানিং রোড, নয়াদিল্লী

# রেল দুর্ঘটনার জন্য মার্কিণ ইঞ্জিন দায়ী

## অথচ মার্কিণ স্বার্থে রেল কর্মচারীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

"এই সমস্ত সাংঘাতিক দুর্ঘটনা রেল লাইনের ত্রুটিতে ঘটে নাই। আমাদের লাইন নূতন আমদানী ইঞ্জিন চালাইবার উপযুক্ত নয় অথবা সেগুলি ঠিকমত মেরামত হয় না, এই যে সমস্ত অভিযোগ উঠিতেছে তাহার জন্য আমি উপরোক্ত কথার উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। আমেরিকা ও কানাডা হইতে আমদানি ইঞ্জিনগুলি যে সমস্ত দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে তাহার জন্য উহাদের 'ডিজাইন বা কোয়ালিটি' দায়ী এইরূপ সন্দেহ করিবার মত কোন প্রমান নাই।" অর্থাৎ এক কথায় সরকারের রেলনীতির কোন দোষই নাই।

সত্যই কি তাহাই? এই কথা বিচার করিতে হইলে মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতাটির সত্যতা নিরূপন করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন, রেললাইনের ত্রুটিতে রেল দুর্ঘটনা হয় নাই। অথচ ১৯৪৮ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে আয়েঙ্গার মহশয়ের নিকট কুঞ্জুরু কমিটি রেল পরিচালনা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করে তাহাতে স্বীকার করা হইয়াছে—"in the matter of sleepers and rails" গলদ আছে, লাইনে "weak link" এবং "to meet the future demands for increase in traffic and acceleration in train speeds" ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং ইহার পর রেল লাইনে ত্রুটী নাই এ কথা বলা যায় না। সর্বশেষে কমিটি মন্তব্য করিয়াছিল—লাইনের রেল সর্বত্র উপযুক্ত নয়, স্লিপারের সংখ্যা প্রয়োজন মাফিক দেওয়া হয় নাই, মেরামতের ব্যবস্থা অতিশয় ত্রুটীপূর্ণ এবং লাইনের নীচে জোর দিবার জন্য যে পাথরের দরকার তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। ইহা হইল দেড় বৎসর আগেকার কথা। তাহার পর যাত্রী সংখ্যা বাড়িয়াছে, গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে লাইনের উপর চাপ বাড়িয়াছে; অথচ ইহাদের প্রত্যেকটির জন্যই লাইনের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থা অনুযায়ী লাইন বিশেষ ত্রুটীপূর্ণ সন্দেহ নাই। তবুও মন্ত্রী মহাশয়ের বাধে নাই লাইনের দোষ নাই বলিতে। ইঁহারা যখন জনসাধারণ যখন এত কথা জানে তখন মিথ্যা বলিয়া সাফাই গাহিলে শুনে কে? কিন্তু ধাপ্পা চিরকাল সকলকে দেওয়া যায় না এই কথা মন্ত্রীদের বুঝিবার এবং জনসাধারণের মন্ত্রীমণ্ডলীকে আন্দোলন মারফৎ বুঝাইবার দিন আসিয়াছে।

তাহার পর রেলমন্ত্রীর বক্তব্য কানাডা ও আমেরিকা হইতে আমদানীকৃত ইঞ্জিনগুলির কোন দোষ নাই ও দুর্ঘটনার জন্য তাহারা দায়ী নয়। অথচ কমিটি তাহার রিপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ করে, প্যাসিফিক টাইপ ইঞ্জিনগুলি গতিবেগ বাড়িলেই hunting করে অর্থাৎ সামনের দিকে গোঁত্তা মারে। "The story of the purchase and operation of these locomotives have been tragic"—এই ইঞ্জিনগুলি ক্রয় ও চালান মর্ম্মন্তুদ বিষয় হইয়াছে; সুতরাং ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় বিপদে পড়িতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে কমিটির উপদেশ ছিল পরীক্ষা ব্যতীত যেন নূতন ইঞ্জিন কেনা না হয়, "We wish to emphasise that bulk orders for these locomotives should be placed not only after these engines have been fully tested but also after modifications found necessary have been proved to be effective in service।" এই উপদেশ রহিল ড্রয়ারে বন্ধ হইয়া। এক একটি ইঞ্জিন কয়েক লক্ষ ( সম্ভবতঃ) প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কিনিয়া তাহাকে আবার উপযুক্ত করিতে লাগিয়াছে বি, বি. সি. আই. আরের হিসাব মতে ১ লক্ষ টাকা। জানা গিয়াছে ৫০ বৎসর চলিবার কথা থাকিলেও ২ বৎসরের মধ্যেই এই অভিনব চাজগুলি অকেজো হইয়া পড়িতেছে। তবুও বলিতে হইবে W. P. ইঙ্গিনগুলির ডিজাইন ও কোয়ালিটির কোন দোষ নাই।

দোষ থাকিলেও দোষ থাকিবে না। যেহেতু ইহা সরকারের রেলনীতির সহিত জড়িত। ইংরাজ সরকার বিহিটা দুর্ঘটনাকে যেমন সাবোটাশ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল নিজেদের রেল্‌নীতির গলদ ঢাকিবার জন্য কংগ্রেসী সরকার তেমনই সেই একই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই কথায় সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। জনসাধারণকে বেসরকারী তদন্তের দাবী করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রেলনীতির ফল হিসাবে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং রেলকর্ম্মচারীদেরও তাহাদের উপর অন্যায় ভাবে মিথ্যা দোষ চাপাইবার চেষ্টাকে বানচাল করিবার জন্য জনসাধারণের আন্দোলন যুক্ত করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়িবে। এই জনসমর্থন ও নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তি আগামী বিরাট ছাঁটাইকে প্রতিরোধ করিবে।

# কংগ্রেসী নেতার গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার

## জমি দখল ও মারধোরের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়

( সংবাদদাতার পত্র )

সংবাদে প্রকাশ ধলভূম মহকুমার আসানবনী তরফের হাতিবিন্দা মৌজার নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও জেলা বোর্ডের সভ্য শ্রীহরিপদ মাহাত তাহাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া বহুদিন যাবৎ অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে সেই অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মনেন্দ্র তাঁতী ও বলরাম গোপ নামে দুইজন গরীব চাষী তাহাদের জমির খাজনা গ্রামের প্রধান হিসাবে উক্ত কংগ্রেসী নেতাকে দেয়। কিন্তু খাজনার কোন রসিদ না দিয়া জামসেদপুর কোর্টে উহাদের নামে বাকী খাজনার মামলা গোপনে দায়ের করে এবং কোর্টের সমন কৌশলে চাপিয়া দিয়া উহাদের নামে ডিক্রী জারী করাইয়া তাহাদের জমি দখল করিয়া লয়।

অপর একটি ঘটনায় প্রকাশ যে, একজন অজ্ঞ চাষার পূর্বপুরুষের নামীয় জমির মালিকানা স্বত্ব তাহার নামে করিয়া দিবে এই বলিয়া গরীব চাষীটির নিকট বেশ কিছু টাকা লয়। পরে সে বিষয়ে একেবারে বেমালুম চাপিয়া যায়। মাহাতোর এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে মারধোর করায় ভয় দেখান হইতেছে এবং এখন আবার তাহার সহিত জোর করিয়া হাঁস মুরগী কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে।

গ্রামবাসীরা সার্কেল অফিসারের কাছে নালিশ করায় সার্কেল অফিসার অনুসন্ধান করিয়া যায় কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইলেও মাহাতোর কোন শাস্তি হয় নাই এমন কি তাহার অত্যাচারের মাত্রাও কমে নাই। আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হইবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া গ্রামের গরীব চাষীরা গণ কমিটি মারফৎ সংঘবদ্ধ আন্দোলন দ্বারা ইহাকে প্রতিরোধ করার জন্য তৈয়ারী হইতেছে।

---

( ২এর পাতার পর )

হিসেবে যুদ্ধ ঘাঁটি গাড়বে। কাজেই, সিডনী সম্মেলনের আলোচনাকে কার্যকরী করতে গেলেই মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের অধানতা স্বীকার করতেই হয়। অর্থাৎ চীন, সোবিয়েতকে মারবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে আমেরিকা যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি করেছে জাপান ফিলিপাইনকে নিয়ে, এই ডলার বাঁধ নিয়ে কমনওয়েলথকেও মেনে নিতে হবে এই চুক্তিকে। অর্থাৎ শুধু যে মুক্তিকামী মানুষকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়তে হবে, তাই নয়, এই সব ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে আর একটি যুদ্ধ-বোঝা মেনে নিতে হবে।

কিন্তু, এই যুদ্ধ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতেই হবে। তার গুরুদায়িত্ব বামপন্থী দলগুলির। আজ বামপন্থী ঐক্যের ভেতর দিয়ে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে একতাবদ্ধ করতে হবে, প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে, সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সমাজতন্ত্রের লড়াইকে জোরদার করতে হবে। কারণ ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের মধ্যে দিয়েই স্থায়ী শান্তি আসবে, একমাত্র এই পথেই তা আসতে পারে। আর এই সমাজতন্ত্রের লড়াই হচ্ছে, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই। আজ একচেটে পুঁজির দিনে ছোট ও বড় বুর্জোয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বকে দেখে ছোট বুর্জোয়াদের সমাজতন্ত্রের শক্তি হিসেবে ভাবা ভুল। ভারতবর্ষে-গোটা পাঁচেক পরিবার হল বড় বুর্জোয়া আর বাকি সব ছোট এবং এই ছোট ছোট বুর্জোয়ারা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়বে এই কথা বলা আর গোটা ধনিক শ্রেনীই সমাজতন্ত্রের শক্তি ভাবা একই কথা। ঐক্যবদ্ধতার কথার 'হুজুকে' মাতলে এই ধরণের চিন্তা দেখা দিতে বাধ্য। বামপন্থী ঐক্য বদ্ধতা কেন এবং আজকের দিনে কাদের সঙ্গে তা হতে পারে একথা ভুলে ঐক্যবদ্ধতার কথা বলায় ভাবালুতার পরিচয় হতে পারে, মার্কসবাদীর নয়। তবে, শান্তির লড়ায়ে, একচেটে পুঁজিবাদীদের যুদ্ধ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওদের অসন্তোষকে কাজে লাগান গেলে, তা অবশ্যই করতে হবে। তবে আজ তা ব্যক্তি হিসেবেই পাওয়া সম্ভব, শ্রেণী হিসেবে নয়।

কমিনফর্মের নির্দেশকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে না দেখলে, এদেশে শ্রমিক আন্দোলনে আবার একটা ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে।

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

# কংগ্রেসী রামরাজত্বে গণতন্ত্রের নমুনা

## বিনা বিচারে প্রায় ২৫ হাজার রাজনৈতিক কর্ম্মী কারাদণ্ড

## প্রায় অর্দ্ধশত সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ

### *গুলি ও লাঠির দাপটে সভাসমিতির অধিকার অস্বীকার*

ভারতীয় রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্র রক্ষা সম্বন্ধে বড় বড় প্রতিশ্রুতি আছে। ভারতীয় রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্র নয়; সভা সমিতি করার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে বহু কথাই লেখা আছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেল সাংবাদিকদের দেশের প্রতি কি কর্ত্তব্য আছে তাহা বুঝাইয়াছেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ত সারা পৃথিবীর গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। সেই কারণেই নাকি তিনি ইঙ্গমার্কিণ ছত্র ছায়ার নীচে বসিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। সুতরাং নিরীহ ভারতবাসীরা ভাবিতেছেন, সত্যই বুঝি কংগ্রেসী নেতারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য উদগ্রীব। ভারতবর্ষে আসল অবস্থা কি তাহা ভাবিলে কংগ্রেসী গণতন্ত্রের চেহারা ভালভাবে বুঝিতে কাহার কোন অসুবিধা হইবে না। পণ্ডিত নেহেরু প্রায়ই আন্তর্জাতিকতার বড়াই করেন; কথায় কথায় উদাহরণ হিসাবে তিনি ইঙ্গ মার্কিণের দোহাই পাড়েন। তাঁহার উপাস্য ও নমস্য ইংলণ্ড ও মার্কিণ মুল্লুকে কি ভারতবর্ষের মত দমননীতি চলে? হিটলারের আমলে জার্ম্মানী, মুসোলিনীর ইতালী, ফ্রাঙ্কোর স্পেন এবং চিয়াংএর চীন ব্যতীত অন্য কোন দেশেই কংগ্রেসী নেতাদের মত এমন নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিচারে দমন নীতি চালাইতে অন্য কাহাকেও দেখা যায় নাই। এই সব আন্তর্জাতিক ঝানু ফ্যাসিষ্ট নেতাদের নীতি হইল পণ্ডিত নেহেরুর আন্তর্জাতিকতা।

যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের গোড়ার কথা হইল ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করার অধিকার। ইংলণ্ডের মত জবরদস্ত পুঁজিবাদী দেশে চার্চিল রক্ষণশীল দলভুক্ত এবং পামি দত্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য বা অন্য কেহ অন্য দলভুক্ত বলিয়া এট্‌লি সরকার তাহাদের কারারুদ্ধ করে নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাহারও অপরাধ প্রমাণ হইতেছে ততক্ষণ তাহাকে দোষী বলিয়া কারারুদ্ধ করা ধনিকশ্রেণীর আইন অনুযায়ীও অন্যায়। অথচ কংগ্রেসী রামরাজত্বে বর্ত্তমানে ২৫ হাজারের মত রাজনৈতিক কর্ম্মী বন্দী আছেন। ইঁহাদের অধিকাংশেরই কোন বিচার হয় নাই, এমন কি ইংরাজ আমলে বিচারের যে প্রহসনটুকু হইত তাহাও হয় নাই। সত্যই যদি ইঁহাদের কোন অপরাধ থাকে তাহা হইলে আইন আদালতে তাঁহাদের সোপার্দ করা হউক। আইন আদালত ধনিক শ্রেণীরই সৃষ্টি। সুতরাং তাহাতেও যদি সাজা না হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে বুঝিতে কষ্ট হয় না, যেহেতু তাঁহারা কংগ্রেসী মতে সর্ব্বদা "হাঁ" দিতে পারেন না সেই হেতু তাঁহাদের কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। শুধু কমিউনিষ্ট ভীতি দ্বারা ইহার সমর্থন পাইতে চাহিলে চলিবে কেন? সাম্যবাদী চিন্তা এখানে বেআইনী নয়। আর কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়াও অসংখ্য বামপন্থী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের আটক রাখা হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকার বিরোধী হইলেই তাহাকে জব্দ করিতে হইবে।

তাহার পর আসে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা। একা পশ্চিম বাংলায় ৩০টির বেশী দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার সবগুলি কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত ছিল না। "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকাকে বার বার জামানৎ জব্দ করিয়া অবশেষে Pre-cencorshipএর খাঁড়ার আঘাতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গোটা ভারতবর্ষ ধরিলে অর্দ্ধ শতের বেশী পত্রিকার গলা টিপিয়া মারা হইয়াছে। যে সমস্ত পত্রিকা সরকারের ঢাকের বাঁয়া হইয়া প্রতিটি সরকারী কাজে (আসলে অকাজ) তাল ঠুকিতে না পারিবে তাহারই দানাপানি উঠিবে। প্রথমে জামানৎ তলব, তাহার পর জামানৎ জব্দ, তাহার পর সরকারের অনুমতিক্রমে সংবাদ ও মতামত ছাপিবার আদেশ সর্ব্বশেষে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধের আদেশ। চমৎকার গণতন্ত্র। নেহাৎ ভারতবর্ষ বলিয়াই পণ্ডিত সর্দ্দার চক্রের এই ঔদ্ধত্য সহ্য হইতেছে তবে ইহাও সঠিক সহ্যের দিন শেষ হইবার বেশী দেরী নাই।

সর্ব্বশেষে সভাসমিতির অধিকার। ১৪৪ ধারার প্রতাপে ত সভাসমিতি করা বন্ধ হইয়াছে। তাহার উপর আছে গুলি লাঠি ও গ্যাসের দৌরাত্ম্য। কথায় কথায় আদেশ চলে "চালাও গুলি", পুলিশ কর্ম্মকর্ত্তারাও দম্ভভরে বলেন—"when we shoot, we shoot to kill"—মারিয়া ফেলিবার জন্যই গুলি চালান হয়। শ্রমিক, চাষ, ছাত্র, স্ত্রী, পুরুষ কেহই বাদ পড়ে নাই। এমন কি জেলের মধ্যেও নিরস্ত্র বন্দীদের গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে বাধে না অহিংসার অবতারদের। দুই বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে জেলের মধ্যে ৮০জন রাজনৈতিক বন্দী মারা গিয়াছেন। ইংরাজ আমলের এণ্ডারসনীয় চণ্ডনীতি ইহার তুলনায় ফিকে হইয়া গিয়াছে। এক গত বৎসরেই জেলে গুলি বর্ষণের ফলে ৩৪ জন বন্দী নিহত ও ৪৩৪ জন আহত হন। জেলের বাহিরেও তদ্রূপ অবস্থা। চলতি বৎসরের প্রথম তিনমাসে শ্রমিকের উপর গুলি বর্ষিত হইয়াছে ১১ বার, চাষীর উপর ৮ বার, ছাত্রের উপর ৫ বার। এই হিসাব কোনক্রমেই পুরা নয়। যত দূর জানা গিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ইহা লেখা হইল। আসল অবস্থা ইহার কত গুণ কে জানে?

পুঁজিবাদ যতই নিজের অন্তর্নিহিত বিরোধের জালে জড়াইয়া পড়িবে, জনতার উপর ততই তাহার আক্রমণ তীব্র হইতে থাকিবে। এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে না পারিলে সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের অপমৃত্যু অবধারিত। আর এই প্রতিরোধের একমাত্র পন্থা নিজেদের সংগঠিত করা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মারফৎ জনমত গড়িয়া তোলা, সেই আন্দোলনকে সর্ব্বভারতীয় রূপ দেওয়া, এবং তাহার মাধ্যমে দেশে প্রকৃত সংগ্রামী গণফ্রন্ট গঠন করা। জনতাকে নিজের প্রয়োজনেই ইহা করিতে হইবে। ইহার সফলতার উপরই তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।

## *কংগ্রেসী রামরাজত্বে সুখের বছর*

### ১০ জন ছাঁটাই শ্রমিকের খাদ্যাভাবে মৃত্যু

কংগ্রেসী আমলে অনাহারে মৃত্যু ও ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করা নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে, পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্ব্বে আসাম, উত্তরে পূর্ব্ব পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে মাদ্রাজ, সমস্ত অঞ্চল হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই কয়েকমাস পূর্ব্বেও গুজরাটে এক ব্যক্তি তাহার দুই পুত্রকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চাহিয়াছে। আসামের করিমগঞ্জে শিক্ষিত যুবক খাইতে না পাইয়া চলন্ত ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, বাংলাদেশে ইহা ত প্রত্যহই ঘটিতেছে। সুতরাং কংগ্রেসী রামরাজত্বে অনাহারে মৃত্যু নূতন কিছু নহে। মন্ত্রী ও কংগ্রেসী নেতারা অবশ্য দেশে বিদেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া প্রচার চালাইতেছেন—ভারতবর্ষে কোন অভাব নেই, জনসাধারণ সুখেই বাস করিতেছে। যাহারা বেতারে দু' একটি বাণী দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করে তাহাদের নিকট হইতে ইহার বেশী কিছু আশা করা ভুল হইবে।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে গুজরাটের ফাইন কাউণ্টস্ মিলের ১২ জন বেকার শ্রমিক না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে। গত বৎসর মিলের কর্তৃপক্ষ মিল বন্ধ করিয়া দেয়। বর্ত্তমানেও নির্বিচারে ছাঁটাই চলিয়াছে। ইতিমধ্যে ৪২ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে, ১৫০ জন শ্রমিক ও ৩০ জন কেরাণীকে ছাঁটা-এর নোটীশ দেওয়া হইয়াছে এবং স্ত্রীমজুরদের বিভাগ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। এইভাবে দিনের পর দিন শ্রমিক কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে ছাঁটাই করা হইতেছে, আর না দেওয়া হইতেছে তাহাদিগকে কোন কাজ। ভারতীয় রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে বলা হইয়াছে, প্রত্যেকের কাজের অধিকার আছে। বিরাটভাবে ছাঁটাই করিয়া অনাহারে মরিতে বাধ্য করিয়া কংগ্রেসী সরকার সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আর ইহা শুধু কংগ্রেসী শাসনের দোষ নয়। পুঁজিবাদ যতদিন ভারতবর্ষে কায়েম থাকিবে ততদিন বেকার. অনাহার, অপমৃত্যু জনজীবনকে টিপিয়া রাখিবে। এই সত্য বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত